ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা ও তত্ত্ব: ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

Management Thought & Theory: History and Evolution

২

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনো পর্যাপ্ত নয়। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপ্রতুল। এ নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই বলেও মনে হয় না। কিন্তু ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা ব্যবস্থাপনা-চিন্তার সৃজনশীল বিকাশের জন্যই আবশ্যক। এ ইউনিটে আমরা এ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করব যাতে বিষয়টি ভারিক্কি হয়ে শিক্ষার্থীর মনের ওপর চাপ না ফেলে। দ্বিতীয়ত, আমরা ব্যবস্থাপনা তত্ত্বসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ওপরও আলোচনা করব। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন তত্ত্ব বাস্তব ব্যবস্থাপকেরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবন করেছেন। বাস্তবতার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ এসব তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা ব্যবস্থাপনার ছাত্র ও ব্যবস্থাপকদের জন্য অপরিহার্য। এ ইউনিটে আমরা দেখব ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলো কীভাবে বিকশিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ২.১: ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারার ইতিহাস

পাঠ - ২.২: ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবলি

পাঠ - ২.৩: ব্যবস্থাপনার অন্যান্য তত্ত্ব

পাঠ - ২.৪: বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা

এ ইউনিটটি রচনার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ মাননান রচিত একটি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ক্লড এস জর্জ-এর History of Management Thought (ড. এম. শামসুর রহমান অনূদিত) বইটি থেকেও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারার ইতিহাস
History of Management Thought

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপনা বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যবস্থাপনার কী অবদান ছিল তা বলতে পারবেন।

ক্লড জর্জের (Claude George) মতে, প্রাথমিক সভ্যতা ব্যবস্থাপনাকে কোনো পরিণতির নিয়ামক বলে স্বীকার করেনি। ফলে এতে ব্যবস্থাপনার উল্লেখও অনেক কম। এছাড়াও প্রতিযোগিতাজনিত গোপনীয়তাবোধ থেকে সফল ব্যবস্থাপকেরা অনেক তথ্য গোপন রেখেছেন; তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত লিখিত বিবরণ একেবারেই বিরল। ব্যবসায়ের ছাত্র হিসেবে বর্তমান ব্যবস্থাপনার অভূতপূর্ব সাফল্য, ব্যবস্থাপনার শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার এবং সামান্য সমাধানের সর্বাধুনিক পদ্ধতি দেখে নিশ্চই আপনার মনে প্রশ্ন জাগে যে, এ অবস্থা কি সে প্রাচীন কাল বা সভ্যতার সূচনাতেই ছিল? ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা প্রাচীনকালে বা সভ্যতার সূচনা লগ্নে এ রকম ছিল না। অনেক মনীষীর ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আধুনিক ব্যবস্থাপনা। মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, স্পেনের আল-হামরা প্রাসাদ, চীনের প্রাচীর, ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান প্রভৃতি কীর্তি ব্যবস্থাপনার নৈপুণ্যের প্রতীক হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে। তবে ঐ সময়ে হয়ত ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক দিকটি ততো উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল না। কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, ব্যবস্থপনার উন্নয়নের ইতিহাস অতি প্রাচীন। আর আমরা তার সফল উত্তরাধিকারী। এ পাঠে আমরা ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপনা বিবর্তনের ইতিহাস
History of evolution management

ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চিন্তাভাবনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। কাজেই ব্যবস্থপনা চিন্তাধারার উন্নয়ন ও বিবর্তন একটি ধারাবাহিক ও নিরন্তন প্রচেষ্টা হিসেবেই চলে এসেছে। আমাদের সমাজে আজ যেমন ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও তো একই সম্যাসার সম্মুখীন হতে হতো! ব্যবস্থপনা বিষয়ে জ্ঞান অনুশীলন ছাড়া তাঁরা তখন সমস্যা সমাধান করতেন কীভাবে? প্রকৃতভাবে তারাও তখন নিজস্ব ব্যবস্থপনা দক্ষতা প্রয়োগ করতেন। সুতরাং তারা নিঃসন্দেহে আমাদের ব্যবস্থপনা গুরু নয় কি? আসুন এখন বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনার ধরন আলোচনা করে দেখি কিছু আহরণ করতে পারি কি না!

মানুষের পারিবারিক জীবন যখন থেকে শুরু হয়েছে মূলত তখন থেকেই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্য সম্পদান করতে দেখা গিয়েছে। পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলতে পরিবারের কর্তাকে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন উপকরণ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, পরিবারের সদস্যদের কাজের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য সমন্বয়ের চেষ্টা করতে হয়েছে, প্রত্যেকে সঠিকভাবে কাজ করেছে কি না তা তদারক করতে হয়েছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা কার্য অতি প্রাচীন কালেও ছিল। কিন্তু তারা ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তখনও দিতে পারেনি বলে তাদের অবদান সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা হয় না। এরপরে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। তারা বিভিন্ন সময়ে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিপদআপদের মোকাবিলা তো করতে হয়েছেই। এ সময় তাদেরও পরিকল্পিতভাবেই সেগুলো করতে হয়েছে। যারা এসব বিপদে ব্যবস্থাপনার প্রাচীন পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেনি তারা নিজেদেরকে বিপদ থেকে রক্ষাও করতে পারেনি। এরপর সময় আরও গড়িয়ে গেলে প্রাচীনকালের মানুষকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়েছে। যুদ্ধে বিজয় অর্জন, কৌশল গ্রহণ, সরঞ্জাম সংগ্রহ ও যথারীতি ব্যবহার, রসদপত্র সরবরাহ, যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কাজে তাদের যথেষ্ট ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ব্যবহার করতে হয়েছে।

কাজেই তাদের কাজ থেকেও ব্যবস্থাপনার চিন্তার খোরাক পরবর্তী যুগের লোকজন লাভ করেছে। প্রাচীনকালে মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজে যেসব নথি, দলিলদস্তাবেজ এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতো সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা অফিস ব্যবস্থাপনায় তাদের অবদানের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হই। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো (পাকিস্তান), মহাস্থান গড়, পাহাড়পুর, ভাওয়ালের গড় এবং বরেন্দ্র এলাকায় (বাংলাদেশ) প্রাচীন যুগের যেসব পুরার্কীতি তথা ঐতিহাসিক নির্দশন আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেও সে যুগের মানুষের নক্সাকরণ জ্ঞানের যে পরিচয় জানা যায় তা আধুনিক প্রকৌশলী ও উৎপাদন ব্যবস্থাপকগনের পাথেয় হতে পারে। আপনি পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের কথা শুনেছেন। এগুলোর মধ্যে মিসরের পিরামিড, ব্যবিলনের শূন্যউদ্যান প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এসবে নির্মাণ কৌশল এত নিখুঁত এবং মজবুত যে তাতে দক্ষ ব্যবস্থাপকের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে যুগ যুগ ধরে। এছাড়া রোমান, গ্রিক, আসিরীয়, ফিনিশিয়, সুমিরীয় প্রভৃতির সভ্যতার যুগে নগর ও বন্দর নির্মান শৈলী, আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা, যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে জানা যায়। ব্যবস্থাপনা জ্ঞান ছাড়া তারা এসব কাজ কীভাবে করতেন, এ প্রশ্ন অনায়াসেই আসতে পারে। ক্যাথলিক চার্চগুলোর অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাগত পদ্ধতির অনুশীলন, খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে মিশরীয়, রোমাক ব্যবস্থাপনা দলিল ও কর্তৃত্ব অর্পণ নীতি প্রভৃতিকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার পথ প্রদর্শক বলে মনে করা হয়। মিশরের ফেরাউনের আমলে বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারি প্রশাসন, পানি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ব্যবস্থার কথাও ইতিহাস থেকে জানা যায়। আসুন, বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যবস্থাপনার কী অবদান ছিল সে সম্পর্কে এবার জেনে নেই।

চীনা সভ্যতায় ব্যবস্থাপনার অবদান

Contribution of management in Chinese civilization

চীনা সভ্যতা থেকেও ব্যবস্থাপনার চিন্তধারার ইতিহাস জানা যায়। বর্তমানে আমরা অফিস ব্যবস্থাপনায় যে নথিকরণ ও সূচিকরণের ব্যবস্থা করি প্রাচীন চীনেও তা ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। মেনসিয়াস এবং চৌ-এর (১১০০ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব) আমলের প্রাচীন রেকর্ড থেকে জানা যায় যে চীনারা সংগঠন, পরিকল্পন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো নিয়ম সম্পর্কে অবহিত ছিল। চীনের দার্শনিক ও ধর্ম প্রচারক কনফুসিয়াস ও লাও-জুর লেখা থেকে জানা যায় যে, তখন লোক প্রশাসন নীতিমালা অনুসরণপূর্বক শাসন কর্তাদের সৎ, নিঃস্বার্থ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৫০০ অব্দে বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো সামরিক গ্রন্থ The Art of War- এর রচয়িতা সান জু (Sun Zu) ব্যবস্থাপনার দুটি বিশেষ দিক-পরিকল্পনা ও নির্দেশনা সংক্রান্ত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১২০ অব্দে চীনা সরকার প্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেও চীন দেশে সর্বাগ্রে শ্রম বিশেষায়ণ নীতি ও মজুরি প্রদান ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটানো হয়।

গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় ব্যবস্থাপনার চিন্তাভাবনা

Management thought in Greek and Roman civilization

প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গ্রিক সভ্যতার অবদানও কম নয়। গ্রিকরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যবস্থানার বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ব্যবস্থাপনার জটিলতাসহ গ্রিসেই প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তৎকালে গ্রিসে যে নগর কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে ওঠে সেখানেও গণতন্ত্রের চর্চা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জনতার কাউন্সিল , আদালত ও বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন, কর্মকর্তা নিয়োগ, সাধারণ কর্মপরিষদ গঠন প্রভৃতিতে আধুনিক ব্যবস্থাপনার অবদান লক্ষ করা যায়। এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি শহরে নগর জীবনের প্রশাসন ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতেন। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটলের লেখায় ব্যবস্থানার চিন্তভাবনা এবং ধ্যানধারণার উল্লেখ আছে।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশে রোম সভ্যতার অবদানও অনস্বীকার্য। বিশাল রোমান সভ্যতায় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা মোকাবিলায় যে সব নীতিমালা কৌশল ব্যবহৃত হতো পরবর্তীকালে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় তার অনুকরণ লক্ষ করা যায়। রোমানদের অনুসৃত ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মধ্যে পরিকল্পনা, বিভাগীয়করণ, সমন্বয়সাধন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ব্যাবসাবাণিজ্যে তাদের সাম্রাজ্যকে অনেক দিন টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক নীতিমালা রোমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারেও সহায়ক হয়। জুলিয়াস সিজারের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস এ ব্যাপারে উল্লেখ করার মতো।

রোমের খ্রিষ্টান ধর্মীয় ক্যাথলিক চার্চগুলো রোমক সভ্যতা ও রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন ও পরিচালনার কৃতিত্বের মূল দাবিদার। তাদের উদ্ভাবিত কৌশলগুলোর মধ্যে শ্রম বিভাজন (division of labour), তত্ত্বাবধান, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষায়ণ, দক্ষ কর্মী নিয়োগ এবং তাদের সুষ্ঠ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এগুলোই ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অতি প্রাচীনকালে চার্চগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়াই যে সব বিধিবিধান উদ্ভাবন করেছিল আজকের পৃথিবীতে তা রীতিমত বিস্ময়য়ের সৃষ্টি করেছে।

প্রাচীন রোমের সেভেন হিলের লেসিয়ান পল্লি অঞ্চলে গড়ে ওঠা কারিগর ও বণিক সম্প্রদায় ব্যক্তি কর্তৃত্বাধীনে কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। ফলে ক্রমান্বয়ে ব্যবস্থাপক শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রবণতা শুরু হয়।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায় ক্যামেরালিস্টদের অবদান

Contribution of Cameralists in management thought

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নয়নে আরেক দল লোক অবদান রেখেছেন বলে জানা যায়। তাদের ক্যামেরালিস্ট নামে অভিহিত করা হয়। তাঁরা জার্মান ও অস্ট্রিয়ার সরকারি কর্মকর্তা এবং বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ। তাঁরা ব্যবস্থাপনা নীতিমালা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে কার্য বিভক্তিকরণ ও বিশেষায়ণ, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বিভিন্ন পদের জন্য কর্মচারী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ, সরকারের কার্যাবলি তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনবোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনাগত পদ্ধতি সহজীকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ক্যামেরলিস্টগণ রীতিবদ্ধ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহের সর্বজনীন দিক নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যে সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটলে একজন ব্যক্তি সম্পদশালী হয়ে ওঠতে পারে সে ধরনের গুনাবলির সমাবেশ যদি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করা যায় তা হলে তা একটি রাষ্ট্রের সঠিক প্রশাসনকে সমৃদ্ধশালী করে এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগসমূহকে পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। প্রাচীনকালের এ সমস্ত ধারণা পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপনার জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে বলে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশে পশ্চিমা লেখকগণও কিছু অবদান রেখেছেন। এসব লেখকদের মধ্যে চার্লস্ ব্যাবেজ (Charles Babbage), রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর (Frederick Winslow Taylor), হেনরি ফেয়োল (Henry Fayol), ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor), এলটন মায়ো (Elton Mayo) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চিন্তাভাবনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। কাজেই ব্যবস্থপনা চিন্তাধারার উন্নয়ন ও বিবর্তন একটি ধারাবাহিক ও নিরন্তন প্রচেষ্টা হিসেবেই চলে এসেছে। প্রাচীনকালে মানুষ তাদের দৈন্দিন কাজে যেসব নথি, দলিলদস্তাবেজ এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতো সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা অফিস ব্যবস্থাপনায় তাদের অবদানের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হই। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ভাওয়ালের গড় এবং বরেন্দ্র এলাকায় প্রাচীন যুগের যেসব পুরার্কীতি তথা ঐতিহাসিক নির্দশন আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেও সে যুগের মানুষের নক্সাকরণ জ্ঞানের যে পরিচয় জানা যায় তা আধুনিক প্রকৌশলী ও উৎপাদন বব্যস্থাপকগণের পাথেও হতে পারে। চীনা সভ্যতা থেকেও ব্যবস্থাপনার চিন্ত-ধারার ইতিহাস জানা যায়। বর্তমানে আমরা অফিস ব্যবস্থাপনায় যে নথিকরণ ও সূচিকরণের ব্যবস্থা করি প্রাচীন চীনেও তা ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গ্রিক সভ্যতার অবদানও কম নয়। ব্যবস্থাপনার জটিলতাসহ গ্রিসেই প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশাল রোমান সভ্যতায় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা মোকাবিলায় যে সব নীতিমালা কৌশল ব্যবহৃত হতো পরবর্তীকালে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় তার অনুকরণ লক্ষ করা যায়। ক্যামেরলিস্টগণ রীতিবদ্ধ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহের সর্বজনীন দিক নিয়েও আলোচনা করেন।

পাঠ ২.২ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবলি
Theories of Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানবীয় সম্পর্ক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবসায় ও শিল্পে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন আচরণ-বিজ্ঞানী ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের লেখক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা-প্রকৃতি বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠনের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এগুলোকে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব তত্ত্বে ব্যবসায় সংগঠনের যেমন কিছু বৈশিষ্ট্য ফোটে ওঠেছে, তেমনি সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মানবীয় সম্পর্কের মতো বিভিন্ন দিকও প্রতিফলিত হয়েছে। তত্ত্বের মাধ্যমে সংগঠনের অভ্যন্তরস্থ উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন করা যায় ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব কতিপয় ধারণা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রকাশিত রূপ যা প্রতিটি সংগঠনেরই আলোচ্য বিষয়।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞানকে এমনভাবে সংগঠিত করে যার সাহায্যে ঘটনা, তথ্য এবং তত্ত্বাবধান নিয়মাবলি এমনরূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, তা থেকে নতুন অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। শ' এবং কোস্টানজো (Shaw & Costanzo) বলেন যে, একটি তত্ত্ব সাধারণত বেশি সংখ্যক অনুমিতি (propositions) ছাড়াই গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। এছাড়া, তত্ত্ব আমাদের জন্য আরও একটি কারণে প্রয়োজন; আর তা হচ্ছে, এটি অবিরাম গবেষণা কার্যের প্রতি পথ-নির্দেশ করে যা থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। এ পাঠে আমরা ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ব্যবস্থাপনার প্রধান তত্ত্বসমূহ
Major theories of management

ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অনেকগুলো তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে। তত্ত্বগুলোকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অত্র গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন পাঠে প্রাসঙ্গিকভাবে এ তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করব বিধায় এ পাঠে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করছি না। এখানে আমরা প্রধান প্রধান তত্ত্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করব।

☞ **ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical theory):** প্রাক-শিল্প বিপ্লবের যুগ থেকে শুরু করে যে সমস্ত ব্যবস্থাপনাদি যেসব তত্ত্ব দিয়েছেন সেগুলোই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মধ্যে পড়ে। এ তত্ত্ব প্রধানত তিনটি আলাদা আলাদা তত্ত্বের সমন্বিত রূপ। যেমন- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্র তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানত প্রাচীন মিশর, গ্রিস ও রোমের সংগঠনসমূহে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উপরন্তু মধ্য যুগে যখন খ্রিষ্টানদের গির্জাগুলো সুপার স্টেট হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে তখন রোমের আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। শিল্প বিপ্লবের পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন উৎপাদন পদ্ধতিতে রাতারাতি আমূল পরিবর্তনের ঢেউ লাগে, তখন Henri Fayol-এর মতো কতিপয় ব্যবস্থাপনাবিদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ পুস্তক রচনা করেন। তখন থেকেই ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে মানুষ নব নব ধারণা লাভ করতে থাকে। এ সময় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা আন্দোলন বেশ তুঙ্গে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নীতির ওপর ভিত্তি করে কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উন্নত কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয়টি যখন প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করে, তখনই মানুষ ব্যবস্থাপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠতে থাকে। অপরদিকে কর্মীগণও ব্যবস্থাপনার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

এমনিভাবে প্রতিষ্ঠান ও তার ব্যবস্থাপনা উভয়ই উপকৃত হতে থাকে। F.W.Taylor এর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, Henry Fayol-এর ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি ও নীতিমালা ইত্যাদি শিল্প সংগঠনের ব্যবস্থাপনা দর্শনকে রীতিমত পরিবর্তন করে ফেলে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পাঠ ২.৪ -এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রায় একই সময়ে বহুল আলোচিত আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) নামক একজন আচরণ বিজ্ঞানী। ১৯২১ সালে জার্মানিতে যখন তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন জার্মানিতে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। ওয়েবার তখন এসব সংগঠনের অধিকতর আনুষ্ঠানিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে আদর্শ ক্যাডার হিসেবে দেখতে চান। তিনি তাঁর তত্ত্বে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেগুলো হলো:

১	প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার লাল ফিতার দৌরাত্ম্য থাকবে না;
২	অদক্ষতার লেশমাত্র থাকবে না এবং
৩	আধুনিক সমাজের উপযোগী অত্যন্ত দক্ষ একটি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে ওঠবে।

ওয়েবারের আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব প্রথমে এভাবেই একটি প্রশাসনিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি অতি চমৎকারভাবে সংজ্ঞায়িত কাজ (defined work), কর্তৃত্বের স্থিতিশীল কাঠামো, স্থায়ী দলিল এবং প্রক্রিয়ার সিস্টেম প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। সুতরাং এ সময় অবাধ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের বেশ উন্নতি সাধিত হয় এবং পরবর্তীতে আরও অনেক গবেষণা কার্য এসব বিষয়ে সম্পাদিত হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের বিকাশে আরও যারা অবদান রাখেন তাঁরা হলেন মেরি পার্কার ফলেট (Mary Parker Follet), চেস্টার আই বার্নার্ড (Chester i. Barnard) ও লিন্ডাল ইউরিক (Lyndall Urwick)। ফলেট (১৮৬৮-১৯৩৩) সাংগঠনিক ও মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকগুলো নতুন উপাদান প্রর্বতন করেন। তিনিই বলেছিলেন: ব্যবস্থাপনা হলো মানুষের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল (Management is the art of getting things done through people)। বার্নার্ড (১৮৮৬-১৯৬১) তাঁর বিখ্যাত ‘‘The Functions of the Excutive” বইতে কর্তৃত্ব গ্রহণের বিষয়ে তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি বলেছেন যে, অধিনস্থরা সুপারভাইজারের নির্দেশের আইনানুগতা বিচার করে দেখে এবং তারা সেটি গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। একটি আদর্শ নির্দেশ গৃহীত হয় তখনই যখন অধীনস্থরা সেটা বোঝতে পারে, সেটা প্রতিপালন করার সামর্থ্য রাখে এবং সেটাকে যথোপযুক্ত মনে করে। ইউরিক ব্রিটিশ আর্মি অফিসার হিসেবে অবসর নেওয়ার পর একজন ব্যবস্থাপনা তাত্ত্বিক ও কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি ফেয়ল ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তাত্ত্বিকদের কাজের সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়সাধন করেন। তিনি পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলিতে আধুনিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলিতে আধুনিক চিন্তা ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

☞ **মানবীয় সম্পর্ক তত্ত্ব (Human relation theory):** এ তত্ত্বকে কোনো কোনো ব্যবস্থাপনাবিদ নেতৃত্ব (leadership) তত্ত্ব বা আচরণ বিজ্ঞান (behavioral science) তত্ত্ব নামে উল্লেখ করেছেন। এসব তত্ত্বে মানবীয় দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের দলীয়ভাবে কাজ করতে হয় বলে তাদের উচিত পরস্পরের সম্পর্কে জানা (people should understand people)। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় নির্বাহী, সরকারি প্রশাসক ও সশস্ত্র বাহিনীতে টেকনোক্র্যাটগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সমাধানের প্রতি সমাজ বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বৃটেনে শিল্প ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ছিল কর্মীদের শান্তি ও দুর্ঘটনা হ্রাস করা। ব্যক্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পরিবেশগত উপাদান, যেমন- তাপমাত্রা, আদ্রতা প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার দরকার ছিল। ১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনীতে লোক নির্বাচনের প্রাক্কালে ব্যবহারের জন্য মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা (Psychological test) উদ্ভাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও বৃটেন এবং আমেরিকায় নতুন মনস্তাত্ত্বিক নির্বাচন কৌশলগুলো ব্যাপকভাবে মনোবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানবীয়

সম্পর্ক তত্ত্বে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদান ও সেবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানবীয় ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের যে অবদান আছে তা স্বীকার করে নিয়ে কর্মীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ তখন বিশ্বাস করা হতো যে, কর্মীরা যেহেতু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপদান, সেহেতু তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংগঠনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। ব্যবস্থাপনার এ তত্ত্ব ফলপ্রসূ যোগাযোগ, কর্মীদের মনোবল উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কর্মীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। এ তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন এলটন মেয়ো (Elton Mayo)। অন্যান্য যাঁরা এর উন্নয়নের অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মেরি পার্কার ফলেট, সি. আই. বার্নার্ড, জেমন মার্চ, হারবার্ট সাইমন, কুর্ট লিউইন, আব্রাহাম মাজলো, ম্যাক গ্রেগর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী পাঠে আমরা সিস্টেম, পরিস্থিতিগত, গতিশীল সম্পৃক্ততা এবং সমকালীন ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনার চারটি কার্য সম্পাদনের জন্য একজন ব্যবস্থাপককে কতিপয় মুখ্য ভূমিকা যেমন পালন করতে হয়, ঠিক তেমনি তার কতিপয় দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। মিনজবার্গ তাঁর নিজের এবং অন্যদের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ব্যবস্থাপকরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন: আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা, তথ্য সংশ্লিষ্ট ভূমিকা এবং সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা। ব্যবস্থাপকের আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা বলতে আনুষ্ঠানিক কর্তা, নেতা ও সংযোগকারী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কর্তব্য ও কাজকে বোঝায়। তথ্য সংগ্রহ ও আদানপ্রদান সংশ্লিষ্ট ভূমিকাকে ব্যবস্থাপকগণের তথ্য সংশ্লিষ্ট ভূমিকা বলে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একজন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে ভূমিকা রাখেন। ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোক্তা হিসেবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, একজন সফল ব্যবস্থাপকের কতিপয় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। কারিগরি দক্ষতা বলতে ব্যক্তির যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়া বা কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান বা যোগ্যতাকে বোঝায়। মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা বলতে লোকের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার এবং দলগত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতাকে বোঝায়। একজন ব্যবস্থাপকের সাংগঠনিক বিষয়াদির বিভিন্ন দিক সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাই অনুধাবন দক্ষতা। এরূপ দক্ষতা ব্যবস্থাপকের চিন্তন-শক্তির ওপর নির্ভর করে। একজন ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান দিতে হয় তাই ব্যবস্থাপকের সমস্যা নির্ণায়ন ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য।

পাঠ ২.৩ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য তত্ত্ব
Other Theories of Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলো বলতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে আমরা ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব এবং মানবীয় সম্পর্ক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্যবস্থাপনার আরও কিছু জনপ্রিয় তত্ত্ব রয়েছে যা ব্যবসায়ের একজন ছাত্র হিসেবে না জানলেই নয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে এ তত্ত্বগুলোর আবির্ভাব ঘটেছিল। এ পাঠে আমরা অন্যান্য এ তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যবস্থাপনার অন্যান্য তত্ত্বসমূহ
Other theories of management

☞ **সিস্টেম তত্ত্ব (System theory):** সিস্টেম তত্ত্ব ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে এর বিভিন্ন অংশ যেহেতু পরস্পর সম্পৃক্ত তাই তাদের পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক হয়। সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ যদি পরস্পরের সাথে সহযোগিতা না করে তবে সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জন কষ্টকর হয় এবং এর ফলে সমগ্র সিস্টেম অচল হয়ে পড়তে পারে। ব্যবসায়ের সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের সকল উপকরণ, শক্তি, তথ্য (information process) এবং রূপান্তর প্রক্রিয়াকে (transformation) এক সূত্রে আবদ্ধ করে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করে। নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন।

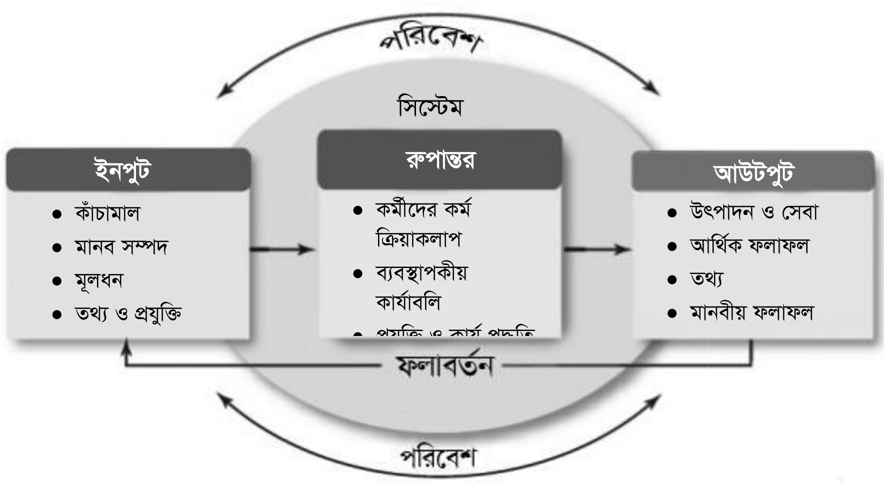

চিত্র ২.১: সাংগঠনিক ওপেন সিস্টেম

ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, ক্লাসিক্যাল ও মানবীয় তত্ত্ব অপেক্ষা খানিকটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানকে যতক্ষণ একটি সিস্টেমে রূপান্তরিত করা না যায় এবং প্রত্যেকটি সাব-সিস্টেমের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও সহযোগিতা সৃষ্টি করা না যায়, ততক্ষণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা আসে না। সিস্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে মার্চ এবং সাইমন (March and Simon) নামক দুজন আচরণ বিজ্ঞানীর ধারণা হলো যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন একই অর্থ বহন করে এবং সিস্টেম সে কারণে সংগঠনের আওতাভুক্ত। এ তত্ত্ব প্রাপ্ত সম্পদ এবং করণীয় কার্য বিবেচনান্তে কাম্য সংগঠন উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ তত্ত্বে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রধানত, তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- কর্মী, প্রযুক্তি এবং অর্থ। ব্যবসায় সংগঠনে উল্লিখিত উপাদানগুলোর উত্তম প্রয়োগ এবং সকল সাব-সিস্টেমের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধানের মাধ্যমেই কেবল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

☞ **পরিস্থিতিগত তত্ত্ব (Contingency or situational theory):** এ তত্ত্বের উদ্ভাবকরা হলেন সেসব ব্যবস্থাপক, কনসাল্ট্যান্ট ও গবেষক যাঁরা প্রধান প্রধান ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে বাস্তব জগতে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, কোনো পদ্ধতি একটি ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে অথচ অন্য ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাংগঠনিক উন্নয়ন কর্মসূচি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে খুবই চমৎকার সুফল দিয়েছে কিন্তু একই কর্মসূচি অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার শিকার হয়েছে। কেন? তাঁরা এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা দেখলেন: ফলাফল ভিন্ন রকমের হয় কারণ পরিস্থিতিও ভিন্ন। এক পরিস্থিতিতে যে কৌশল সফল হবে, অন্যান্য পরিস্থিতিতে সেটি সমভাবে সফল নাও হতে পারে।

পরিস্থিতি তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন ব্যবস্থাপকের কাজ হলো বিশেষ ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে, বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ সময়ে কোন কৌশল বা পদ্ধতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হবে, তা খুঁজে বের করা। পরিস্থিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যসিদ্ধির জন্য সবচেয়ে উত্তম এ বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবস্থাপক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন।

☞ **গতিশীল সম্পৃক্ততা তত্ত্ব (Dynamic engagement theory):** অতি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত "গতিশীল সম্পৃক্ততা তত্ত্ব"-এর উদ্যোক্তারা হলেন স্টোনার, ফ্রিম্যান ও গিলবার্ট। ১৯৯৫ সালে রচিত তাদের স্বনামখ্যাত পুস্তক "Management"-এ তাঁরা এ তত্ত্বের প্রস্তাব করেছেন। Dynamic বা গতিশীল বলতে তাঁরা অব্যাহত পরিবর্তন, প্রবৃদ্ধি এবং কার্যকে বোঝিয়েছেন; আর Engagement বা সম্পৃক্ততা বলতে অন্যদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক (intense involvement with other) বোঝিয়েছেন। তাঁদের মতে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ সফল ব্যবস্থাপক মানবীয় সম্পর্কের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেন।

☞ **সমকালীন ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব (Contemporary management theory):** অনেক লেখক নতুন ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও মডেল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে উইলিয়াম আউচি (William Ouchi) এবং থমাস পিটার্স ও রবার্ট ওয়াটারম্যান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উইলিয়াম আউচি 'জেড তত্ত্বের' (Theory Z) জন্য বিখ্যাত। জেড তত্ত্ব হলো জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমজাতীয় ব্যবসায়িক প্রথাকে একটি একক মধ্যমপন্থী কাঠামোতে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা (an attempt to integrate common business practices in the United States and Japan into a single middle ground framework)। আউচি বলেন যে, অনেক সনাতনী মার্কিনি ফার্ম (Type A নামে আখ্যায়িত) এবং জাপানি ফার্ম (Type J নামে আখ্যায়িত) রয়েছে যাদের মধ্যে সাতটি বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। এ সাতটি বিষয় হলো: (১) কর্মসংস্থানের মেয়াদ (Length of employment), (২) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি (Mode of decision making), (৩) দায়িত্বের স্থল (Location of responsibility), (৪) মূল্যায়ন ও পদোন্নতি গতি (Speed of evaluation and promotion), (৫) নিয়ন্ত্রণের কৌশল (Mechanisms of control), (৬) জীবন-পথের বিশেষায়ণ (Specialization of career path) এবং (৭) কর্মীদের জন্য চিন্তা-উদ্বেগের প্রকৃতি (Nature of concern for employee)। উদাহরণস্বরূপ, অনেক জাপানি ফার্মের বৈশিষ্ট্য হলো জীবনব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পক্ষান্তরে, মার্কিনি ফার্মের বৈশিষ্ট্য হলো স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান ও ব্যক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আউচি মতামত ব্যক্ত করেন, কতিপয় সফল মার্কিনি ফার্ম Type A মডেল অনুসরণ করে না, যথা- হিউলেট প্যাকার্ড, ইস্টম্যান কোডাক ও প্রোক্টর এন্ড গ্যাম্বল। বরং তারা Type A ও TYPE J এর মিশ্রিত মডেল Type Z ব্যবহার করে। আউচির ধারণাগুলো সারা পৃথিবীতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। ১৯৮১ সালে তাঁর বই (Theory Z- How American Business can meet the Japanese Challege) প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন এটি 'বেস্ট সেলার' (best seller) ছিল। অনেক আমেরিকান প্রতিষ্ঠান তাঁর সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে। তবে তাঁর গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে বির্তক দেখা দিয়েছে। অনেকের প্রশ্ন: তিনি কি গবেষণায় যেরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত ছিল তা করেছেন? এসব বিতর্কের পরেও তাঁর তত্ত্বটি বেশ সমাদৃত ।

থমাস পিটারস ও রবার্ট ওয়াটারম্যান ১৯৮২ সালে তাঁদের রচিত In Search of Excellence নামক বইতে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যা 'অনুপমতার জন্য উদ্বিগ্নতা' (Concern for Excellence) নামে পরিচিত। তাঁদের মতে, কিছু অনুপম (excellent) প্রতিষ্ঠান (দীর্ঘ দিন যাবত সফলতার ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান) রয়েছে যেগুলো সুশৃংখলভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করে বলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা ভাবমূর্তির অধিকারী হয়। যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠানকে অনুপমতার দিকে চালিত করে সেগুলো হলো: (ক) সময়মত কার্য সম্পন্ন করা; (খ) গ্রাহকের নৈকট্যে থাকা; (গ) কর্ম-স্বাধীনতা ও উদ্যোগের উন্নয়ন সাধন করা; (ঘ) কর্মীদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক করা; (ঙ) ব্যবস্থাপনার বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ করা; (চ) প্রতিষ্ঠান যা সবচেয়ে ভালো জানে তা করা; (ছ) সহজ সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করা; এবং (জ) যুগপৎ (একই সাথে) কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা চালু রাখা।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, ক্লাসিক্যাল ও মানবীয় তত্ত্ব অপেক্ষা খানিকটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানকে যতক্ষণ একটি সিস্টেমে রূপান্তরিত করা না যায়, এবং প্রত্যেকটি বা সিস্টেমের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও সহযোগিতা সৃষ্টি করা না যায় ততক্ষণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা আসে না। সিস্টেম তত্ত্ব ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের এর বিভিন্ন অংশ যেহেতু পরস্পর সম্পৃক্ত তাই তাদের পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক হয়। সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ যদি পরস্পরের সাথে সহযোগিতা না করে তবে সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জন কষ্টকর হয় এবং এর ফলে সমগ্র সিস্টেম অচল হয়ে পড়তে পারে। পরিস্থিতি তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন ব্যবস্থাপকের কাজ হলো বিশেষ ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে, বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ সময়ে কোন কৌশল বা পদ্ধতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হবে, তা খুঁজে বের করা। পরিস্থিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যসিদ্ধির জন্য সবচেয়ে উত্তম এ বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবস্থাপক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। গতিশীল সম্পৃক্ততা তত্ত্বে গতিশীল বলতে অব্যাহত পরিবর্তন, প্রবৃদ্ধি এবং কার্যকে বোঝানো হয়েছে; আর সম্পৃক্ততা বলতে অন্যদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে। অনেক লেখক নতুন ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও মডেল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে উইলিয়াম আউচি এবং থমাস পিটারস ও রবার্ট ওয়াটারম্যান, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম আউচি 'জেড তত্ত্বের' জন্য বিখ্যাত। জেড তত্ত্ব হলো জাপান ও মার্কিক যুক্তরাষ্ট্রের সমজাতীয় ব্যবসায়িক প্রথাকে একটি একক মধ্যমপন্থী কাঠামোতে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা।

পাঠ ২.৪ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
Scientific Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ বলতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্বের পাঠগুলোতে আমরা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জেনেছি। যে তত্ত্বটি এখনো ব্যবস্থাপকদের ভাবায় সেটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। বিভিন্নভাবে এ তত্ত্বের প্রয়োগ এখনো প্রতিষ্ঠানে হয়ে থাকে। এ পাঠে আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কী, এর নীতিসমূহ এবং এ তত্ত্বের উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করব।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
Scientific management

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার কাজ-কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে। কোনো প্রকার আন্দাজ-অনুমান, পুরাতন পদ্ধতি, সেকেলে যন্ত্রপাতি, অদক্ষ কৌশল প্রভৃতি ব্যবহার করে নয় বরং সম্পূর্ণ পরিকল্পিত উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্বক দক্ষ কৌশল প্রয়োগ করে কর্মীদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এমন প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রবক্তা ফ্রেডেরিক উইনসলো টেইলর (Frederick Winslow Taylor) নিজেই বলেছেন যে, কর্মীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে অন্যের কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে না দিয়ে অথবা যে কোনোভাবে কাজ করার সুযোগ না দিয়ে ব্যবস্থাপকগণের উচিত কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্কিত আইন, বিধি-ফরমূলা প্রণয়ন করা। এছাড়া প্রচলিত জ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একত্রিত করে এবং সেই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদন করাও ব্যবস্থাপনার কর্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি উন্নয়ন বলতে শ্রমিক-কর্মীদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির পরিবর্তে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে তথ্যাদি সংগ্রহ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়ম, বিধি ও ফরমূলা ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পিয়ারসন (Pearson) নামক জনৈক ব্যবস্থাপনার গবেষক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, অনুমান অথবা প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতির ওপর যে ব্যবস্থাপনার জন্ম হয় তাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে। এফ. ডব্লিউ. টেইলরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রবক্তা বলা হয়। কর্মজীবনের প্রথমে ১৮৭৫ সালে তিনি একজন শিক্ষানবিশ যন্ত্র প্রকৌশলী এবং নক্সা প্রণেতা (pattern maker) ছিলেন। নিজস্ব অধ্যবসায়ের বলে তিনি নৈশ কলেজে ভর্তি হয়ে প্রকৌশলী কোর্স সমাপ্ত করেন। এর পরে তিনি মিডভেল স্টীল কোম্পানির (Midvale Steel Company) প্রধান প্রকৌশলী পদ লাভ করেন। তিনি সর্বদাই কামনা করতেন যে, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাক, প্রতিটি ব্যক্তির কর্ম প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ ব্যবহার হোক এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাক। কীভাবে সেটা সম্ভব সে চিন্তার ফসল হিসেবে তিনি "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা" (Principles of Scientific Management) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। এ বইটি ১৯১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ
Principles of scientific management

টেইলর যখন কাজে যোগ দেন তখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অদক্ষতার সাথে উৎপাদন কার্য সম্পাদিত হতো এবং শ্রমিক-কর্মীদের কর্ম প্রচেষ্টার প্রচুর অপচয় হতো। এ দৃশ্য দেখে তিনি চিন্তা করতেন কীভাবে এর নিরসন করা যায়। এ

চিন্তা থেকে তার মাথায় কিছু নীতিমালা অনুসরণের বিষয়টি ঘুরপাক খেতে থাকে। এগুলোকে তিনি তাঁর বইয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা হিসেবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

নীতিগুলো হলো:

১	পুরাতন রীতিনীতির পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মের প্রবর্তন।
২	শ্রমিক কর্মীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩	ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সুমধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।
৪	নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের পরিবর্তে সর্বাধিক উৎপাদান, অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মীর কাজের আওতা নির্দিষ্ট থাকবে যাতে দক্ষতা সহকারে শ্রম ব্যবহার করা যায়।।

টেলর ওপরে আলোচিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতিসমূহ দ্বারা চিরাচরিত পদ্ধতিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লব আনতে চেয়েছেন এবং নিয়োজিত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনপূর্বক তাদের কর্ম-প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

Objectives of scientific management

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পরে কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলশ্রুতিতে বারবার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। আর সার্বিক এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন ঘটেছিল। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ ছিল:

১. কারবার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার পরিমাণ সর্বাধিক করা।
২. উৎপাদন কার্যে স্বল্পব্যয় এবং অপচয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা।
৩. প্রতিষ্ঠানে যাতে চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে ভবিষ্যতে সর্বদাই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে ব্যবস্থা করা।
৪. কার্য সম্পাদন দক্ষতা তথা উৎপাদনশীলতার ওপর ভিত্তি করে শ্রম বিভাজন করা।
৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা।
৬. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের দক্ষতা ও সম্ভাবনার উন্নয়ন সাধন করা।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম সম্পাদনের পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে। কোনো প্রকার আন্দাজ-অনুমান, পুরাতন পদ্ধতি, সেকেলে যন্ত্রপাতি, অদক্ষ কৌশল প্রভৃতি ব্যবহার করে নয় বরং সম্পূর্ণ পরিকল্পিত উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্বক দক্ষ কৌশল প্রয়োগ করে কর্মীদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এমন প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো হলো: পুরাতন রীতিনীতির পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মের প্রবর্তন, বিরোধ সৃষ্টির পরিবর্তে দলীয় কার্যের মধ্যে সৌহার্দ্য আনয়ন, ব্যক্তিক প্রচেষ্টার পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের পরিবর্তে সর্বাধিক উৎপাদান এবং প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক দক্ষতা ও উন্নয়ন অর্জন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পরে কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলশ্রুতিতে বারবার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। আর সার্বিক এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন ঘটেছিল।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবস্থাপনা কী? ব্যবস্থাপনা চিন্তধারার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপনা বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নয়নে চীনা ও গ্রিক সভ্যতার অবদান কী ছিল?
৪. রোম সভ্যতায় ব্যবস্থাপনার অবস্থা কী ছিল তা বিবৃত করুন।
৫. ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ব্যবস্থাপনার প্রধান তত্ত্বসমূহ আলোচনা করুন।
৬. জেড তত্ত্ব কী? এ তত্ত্বের মুখ্য দিকগুলো আলোচনা করুন।
৭. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রবক্তা কে?
৮. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্দেশ্য কী কী? আলোচনা করুন।